সবুজ ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

সবুজের অভিযান

বর্ষ : ১ সংখ্যা ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ দাম ২ টাকা

বিশ্বের উষ্ণায়নে মানুষের ভূমিকা কতটা

দেবকুমার বসু

বিশ্ব পরিমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমবৃদ্ধি সকলের কাছে উৎকণ্ঠার কারণ। কিন্তু কোথা থেকে এই ধোঁয়ার উৎপত্তি হচ্ছে, তার উৎসগুলি কী তা জানা থাকলে এর প্রতিরোধের ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত স্থির করা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নিয়ে যে মতান্তর আছে তা-ও জানা দরকার। একাংশের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ধোঁয়া সৃষ্টির কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম; মানুষের ভূমিকা সামান্য মাত্র। অপর এক অংশের বিজ্ঞানীদের মতে, যা আই পি সি সি-র রিপোর্ট দ্বারা সমর্থিত, সাম্প্রতিক কালে, বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে যে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রকোপ, তাতে মানুষের ভূমিকা, বিশেষ করে শিল্পের ও গাড়ির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই মতের পিছনে আছে দুই রকমের ব্যবহারিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা; একদিকে শিল্প ও গাড়ির ধোঁয়ার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যা শিল্পপতিরা সহজে মানতে রাজি নন, অন্যদিকে সামাজিক স্বার্থে এই ধূম্রজাল সৃষ্টির বিরুদ্ধে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই দুই রকমের যুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর তাপমাত্রা যে ধারাবাহিক বেড়ে যাচ্ছে কিছুকাল ধরে তা সকলের নজরে আনেন। তাপমাত্রার এই ঊর্ধ্বগতিতে উদ্বেগের কারণ ছিল, কেন না বিগত ১০,০০০ বৎসর ধরে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমা-বাড়া হতে থাকলেও মোটামুটি ১৫° সেলসিয়াস-এর ধারে কাছেই থাকছিল। তাই হঠাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতি উদ্বেগের কারণ হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখন প্রশ্ন হল তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতির কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দু'রকম মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করেই, বিশেষ করে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের কক্ষপথের পরিবর্তনের ফলে বহুযুগ ধরে পৃথিবী পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল হয়ে এসেছে চক্রাকারে। এই চক্রের এক একটির আবর্তনকাল হাজার হাজার বৎসর, প্রায় ৪১,০০০ বৎসর ধরে। এর উপর আবার সূর্যের নিজস্ব উত্তাপেরও একটা চক্র প্রায় ১৯০০০ বৎসর ধরে কমা-বাড়ার অবস্থায় থাকে। এই সমস্ত সূত্রগুলির উপর গবেষণা এখনও চলছে, তাতে নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সংগৃহীত তথ্য ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে এটা এখন সাধারণ্যে স্বীকৃত যে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই কোটি কোটি বৎসর ধরে এই অবস্থা চলে আসছে। এরই সূত্র ধরে বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন আমরা এখন এইরকম এক উত্তাপ চক্রের ক্রমবর্ধমান অংশে রয়েছি। সেইজন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক শক্তিই দায়ী। মানুষের ভূমিকা এর মধ্যে নগণ্য।

বিজ্ঞানীদের অপর অংশ মনে করেন সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রাকৃতিক চক্রের আবর্তনে পৃথিবীর যে উত্তাপ বৃদ্ধি তার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে, বছর বছর লাফিয়ে উত্তাপ বৃদ্ধির কোনো প্রমাণ সাম্প্রতিক কালের আগে পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে ১৮৫০ সালে শিল্প বিপ্লবের ফলে জীবাশ্ম জাতীয় জ্বালানি, যথা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় ও তার সঙ্গে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক যথার্থভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

এই বিতর্কের সম্মুখীন হয়ে জাতিসংঘ ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া পরিবর্তনের বিবেচনার জন্য সংগঠন, **ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ** বা **আই পি সি সি**। আই পি সি সি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য সমস্ত দেশ থেকে সেরা বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে যুক্ত করেন। আই পি সি সি এ পর্যন্ত চারটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। চতুর্থ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। নোবেল কমিটি আই পি সি সি-কে কাজের জন্য এই সময় ২০০৭ সালে নোবেল পুরস্কার দেন।

চতুর্থ রিপোর্টে আই পি সি সি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন পৃথিবীর তাপমাত্রার যে ঊর্ধ্বগতি বিংশ বা একবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ করা যাচ্ছে তার জন্য মানুষের কার্যকলাপই দায়ী। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় ঊর্ধ্বাকাশে (stratosphere) কতগুলি গ্যাসের পরিমাণ ও উত্তাপের বৃদ্ধির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই গ্যাসগুলি হল যথাক্রমে কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, পি এফ সি, এইচ এফ সি ও সালফার হেক্সাফ্লোরাইড। এদের **গ্রিনহাউস** গ্যাস বলা হয়। এদের মধ্যে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর ভাগটা সব থেকে বেশি প্রায় ৬৪ শতাংশ স্থান অধিকার করে আছে।

কার্বনডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবীর তাপমাত্রার বিশেষ সম্পর্ক আছে কিনা বুঝতে হলে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনও সাক্ষ্য আছে কিনা তা জানা দরকার। এর জন্য বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ মেরুতে বরফের স্তর থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। কারণ মেরু অঞ্চলে বরফ জমছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে। জমানো বরফের প্রতি স্তরে

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

বরফ কণার মধ্যে সঞ্চিত আছে তখনকার আবহাওয়ায় কী ধরনের গ্যাসীয় পদার্থ ছিল তার পরিচয়। এই ধরনের বরফের স্তর বিন্যাসের বিশ্লেষণ (ice core analysis) থেকে বলা যায় কয়েক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর আবহাওয়ায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল। কয়েক লক্ষ বছর আগে যখন অতিকায় ডাইনোসরেরা ঘুরে বেড়াত তখন পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে তুষারযুগের তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু বিগত ১০,০০০ বছর ধরে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ধারে কাছেই ছিল। এর মধ্যে তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি কমে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাওয়ার সঙ্গে আবার তুষার যুগের মতন অবস্থা সৃষ্টি হয়। ওই সময়কে Little ice age বা ছোট তুষার যুগ বলা হয়। এই অবস্থা বজায় ছিল ১৭০০ সাল পর্যন্ত যখন থেকে তাপমাত্রা আবার ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফিরে আসে। এই প্রায় স্থিতাবস্থার অবসান ঘটে সাম্প্রতিক কালে ১৯৫০ সাল থেকে তাপমাত্রার বৃদ্ধি অল্প করে হলেও ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। চতুর্থ আই পি সি সি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে বিগত বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর তামমাত্রা ০.৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এই গ্রহের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ১ ডিগ্রি থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতন।

গত ১০০০ বছরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর তুষার অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করেছে। হিমালয়, আল্পস ও অন্যান্য পর্বতশ্রেণিতে হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে গেছে ১০ ইঞ্চি। আই পি সি সি আশঙ্কা করছে ২১০০ সালে তা বেড়ে ২৩ ইঞ্চি হতে পারে। এর ফলে সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল এবং দ্বীপগুলি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাহাড়ের হিমবাহ গলে যাবার ফলে নদীতে জলপ্রবাহ কমে যাবে।

সুদীর্ঘ ১০,০০০ বছরে তাপমাত্রার স্থিতাবস্থায় নতুন পরিবর্তনের সূচনা হল আধুনিক শিল্পব্যবস্থার প্রবর্তনের পর থেকে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত গবেষণার পর আই পি সি সি-র বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে আসেন যে পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে গাছকাটা ও কারখানার ধোঁয়ার বিশেষ অবদান আছে।

আই পি সি সি-র এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একাংশ। তাঁদের মতে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই অব্যাহত আছে! তাই দিয়েই বর্তমান সময়ের তাপমাত্রার বৃদ্ধির কারণ বোঝা যায়। কার্বনডাইঅক্সাইড যুক্ত ধোঁয়ার ভূমিকা এখানে নগণ্য।

কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির সঙ্গে উত্তাপের বৃদ্ধির যে একটা সম্পর্ক আছে তা বোঝার সুবিধা হবে সাম্প্রতিক কালের তথ্যগুলি পরীক্ষা করলে। প্রাক্ শিল্পায়ন যুগে, ১৭৫০ সালে আকাশে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল একটি কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসীয় অণুর মধ্যে ১০ লক্ষ ভাগের ২৮০ শতাংশ মাত্র, সংক্ষেপে ২৮০ পি পি এম। প্রায় ১০,০০০ বছর ধরে গড়ে এই পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড আকাশে ছিল। শিল্প বিপ্লবের পর ১৯২৯ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ পি পি এম। এই ২০ পি পি এম নিঃসন্দেহে শিল্প থেকে কার্বনডাইঅক্সাইডের ধোঁয়া থেকে উদ্ভূত। এরপর কয়েক বছর অর্থনৈতিক মন্দার দরুন শিল্প থেকে ধোঁয়া সৃষ্টি হবার মাত্রা কিছুটা কম ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের পর থেকে, যখন আকাশে ধোঁয়া মাপার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়, তখন দেখা যায় আকাশে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতগতিতে। আই পি সি সি-র রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৭ সালে এর ঘনত্ব ৩৮৭ পি পি এম-এ পৌঁছে গেছে।

আকাশে কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির সঙ্গে উত্তাপের সম্পর্ক কিন্তু সরল নয়। ১০,০০০ বছর আগে ছোট তুষার যুগের সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস; আকাশে তখন গ্রিনহাউস গ্যাসের উপস্থিতি ছিল না অনুমান করা হয়। পরবর্তী কালে ১৭৫০ সালে যখন আকাশে কার্বনডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব ২৮০ পি পি এম তখন তাপমাত্রা হল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, অর্থাৎ আগের তুলনায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এই অবস্থায় মনে হতে পারে কার্বনডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব যখন দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ ৫৬০ পি পি এম হবে তখন তাপমাত্রাও বাড়বে সমপরিমাণে, অর্থাৎ আরও ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। আই পি সি সি-র বৈজ্ঞানিকদের হিসাবে দেখা যায় যদি কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিকই দ্বিগুণ হয় তাহলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি হতে পারে কয়েক ডিগ্রি মাত্র। কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রার বৃদ্ধি যদি এতই অল্প হয় তাহলে এত চিন্তার কারণ কী?

চিন্তার কারণ এই যে শুধু কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির জন্যই পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তা নয়। বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বের উষ্ণায়নের সমস্যাটিকে দুই দিক থেকে বিশ্লেষণ করেন। প্রথমত, সূর্যের তেজ সবসময়ে একই রকম থাকে না। সৌর কলঙ্কের দরুন এর তেজ কমে যায় কিছু সময়। দ্বিতীয়ত, গ্রিনহাউস গ্যাসের তীব্রতা কোনও সময়ে কম বা বেশি হতে পারে। এই সবের সামগ্রিক ফল নিয়েই পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থির হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় feedback বা পৃথিবীর জবাবী প্রতিক্রিয়া (reactions in response)। এই প্রতিক্রিয়ার ফল ইতিবাচক হতে পারে; নেতিবাচকও হতে পারে।

সূর্য ও গ্রিনহাউস গ্যাসের মিলিত প্রভাবের অনুসরণ করে যখন জবাবী প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হয়, তখন তা পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। আর যখন জবাবী প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হয় তখন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে দুটি ভিন্ন মত আছে। বিজ্ঞানে ভিন্ন মত ও বিতর্ক বিজ্ঞানের প্রগতির পক্ষে সহায়ক। এ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু অন্য ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন দুটি ভিন্ন মতের অনুসরণ করে বাস্তবে দুটি বিপরীত ধরনের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা আসে। আই পি সি সি-র মতে বিশ্বের উষ্ণায়নে জবাবী প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হবার দরুন তাপমাত্রা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। এই অবস্থায় আই পি সি সি বৈজ্ঞানিকদের মতে, কার্বনডাইঅক্সাইড দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রা ১.৫-৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস মতন বেড়ে যেতে পারে। তাই অবিলম্বে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ দরকার যেহেতু মানুষের নিজের কাজের জন্য ধোঁয়া বাড়ছে ক্রমাগত, তাই দেশের নাগরিকদের, বিশেষ করে শিল্পপতিদের উদ্যোগ নিতে হবে কী করে ধোঁয়া কমানো যায়। এই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চলছে। তার কিছু ফল দেখাও যাচ্ছে।

অন্যদিকে যাঁরা মনে করেন পৃথিবীর জবাবী প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক তাঁদের মতে এই অবস্থায় মানুষের কিছু করবার নেই। তাঁদের যুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ১০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে বরফ জমে থাকার

এর পর তিনের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

অবস্থার অবসান হয়েছে। আকাশে এই সময়ে কার্বনডাইঅক্সাইড পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার জন্যই হয়েছে; সেইজন্যই বরফ গলে তুষার যুগের অবসান হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে কার্বনডাইঅক্সাইডের জন্য পৃথিবী উত্তপ্ত হয় না, বরং পৃথিবী উত্তপ্ত হলেই কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি হয়। এর মধ্যে মানুষের কোনও ভূমিকা নেই। কাজেই কার্বনডাইঅক্সাইড কমানোর জন্য চেষ্টা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

অপর পক্ষের বিজ্ঞানীরা তুষার যুগ, অর্থাৎ ১০,০০০ বছর আগের সময়ের পক্ষে যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করেন। ১০,০০০ বছর পেরিয়ে ১৬০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই অবস্থা চলেছিল মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ১৮০০ সালের পর, বিশেষ করে ১৮৫০ সালের পর থেকে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে পুঞ্জীভূত কার্বনডাইঅক্সাইডের আকস্মিক উর্ধ্বগতি তা এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কার্বনডাইঅক্সাইডের এই উর্ধ্বগতি বর্তমান শতাব্দীতে অব্যাহত রয়েছে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বিশ্বের উষ্ণায়ন।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে কার্বনডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির সঙ্গে উষ্ণায়নের যে সম্পর্ক তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তা সর্বকালের জন্য সত্য। আধুনিক কালে কার্বনডাইঅক্সাইডের যে ক্রমবৃদ্ধি তা-ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করেই হচ্ছে। এর মধ্যে মানুষের হাত থাকলেও তা সামান্য।

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সমর্থক বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিশ্বের উষ্ণায়নের কারণ একাধিক, যেমন পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন, সৌর দীপ্তির পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, পৃথিবীর থেকে উদ্ভূত বাষ্পীয় মেঘ এবং শিল্পের ও পরিবহনের থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া ইত্যাদি হতে পারে। এর সবগুলি সব সময়ে একই ভাবে কাজ করে না। এই জন্য এরকম কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সর্বকালের জন্য একই ব্যাখ্যা একই ভাবে বহাল থাকবে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দকে প্রাক্-শিল্পায়ন সীমারেখা মনে করলে দেখা যায় ১৮৬০ সাল থেকে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আই পি সি সি-র ১৯৯৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব দেখা যায় ৩৪০ পি পি এম। আর আই পি সি সি-র ২০০৭ সালের রিপোর্টে এই ঘনত্ব ৩৮৭ পি পি এম-এ পৌঁছে গেছে।

আই পি সি সি-র মধ্যে এবং বাইরে বিজ্ঞানী মহল ছাড়াও রাষ্ট্রীয় নেতাদের মধ্যেও গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা চলেছে। সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতারা একমত হয়েছেন যে এখনই সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর চেষ্টা করে কার্বনডাইঅক্সাইডের ঘনত্বের উর্ধ্বগতি ৪৫০ পি পি এম-এর মধ্যে না রাখতে পারলে উষ্ণায়নের গতি লাগামছাড়া হয়ে যাবে। তখন আর উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের কোনও ক্ষমতা মানুষের হাতে থাকবে না। জুলাই, ২০০৯ ইতালিতে ১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা যাঁরা এই বিষয়ে সহমত হন, ভারতবর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষে এই নিয়ে অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু এত চিন্তার কিছু নেই এই জন্য যে ভারতবর্ষকে এখনও ধোঁয়া ছাড়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা দেওয়া হয়নি। অনেকে আশঙ্কা করেন আগামী ডিসেম্বর মাসে বালিতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে সেখানে হয়তো এমনই কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে। আমাদের মনে হয় এরকম কোনও আশঙ্কা না করে আমাদের নিজেদেরই স্থির করা উচিত আমরা কীভাবে আমাদের কার্বনডাইঅক্সাইড নিয়ন্ত্রণ করব। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি, দর্শন ও পরিবেশ

মানস প্রতিম দাস

এই নিবন্ধ শুরু করা যেতে পারে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র সর্বাধুনিক প্রকল্পের কথা দিয়ে। নাসার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি শৈবাল ব্যবহার করে একই সঙ্গে পৌর আবর্জনাকে দূষণমুক্ত করা এবং জৈব জ্বালানি তৈরির উপায় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। অ্যালগি বা শৈবাল থেকে তেল তৈরি করার প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়। ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'অ্যাকোয়াটিক স্পিসিস প্রোগ্রাম' নামে যে প্রকল্প শুরু হয়, ১৯৯৮ সালে সেটাই অ্যালগি থেকে বায়োডিজেল তৈরি সম্ভব বলে রিপোর্ট দেয়। সেই থেকে এ নিয়ে বেশ কিছু সংস্থায় ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কার্বনডাইঅক্সাইডের মত গ্রিনহাউস গ্যাসকে অ্যালগি বা শৈবালের শরীরে আটকে ফেলা যায়। ফলে পরিবেশেরও উন্নতি ঘটে। অ্যালগি থেকে বায়োডিজেল তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় বিশাল মাপের পুকুর। সেখানে নোংরা বর্জ্য জল থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে বেড়ে ওঠে শৈবাল শরীরে যথেষ্ট তেল ধারণ করে। কিন্তু এতে অনেকটা জমির প্রয়োজন হয়। নাসার বিজ্ঞানীরা জমি নিয়ে টানাটানি না করে সমুদ্রকে ব্যবহার করেছেন। সরল প্রক্রিয়া তাঁদের। অর্ধ্বভেদ্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ফেলো জলীয় পৌর আবর্জনা। তার মধ্যে ছেড়ে দাও শৈবাল এবং সেই ব্যাগ ভাসিয়ে দাও। ব্যাগ থেকে পরিশুদ্ধ জল বেরিয়ে যেতে পারবে কিন্তু সমুদ্রের লবণাক্ত জল ব্যাগের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। সবুজ শৈবাল সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে চলবে যা থেকে পরবর্তী কালে তৈরি হবে তেল। বেশ জমকালো উচ্চাশা নাসার বিজ্ঞানীদের। প্রতি বছর মার্কিন বিমানের উড়ানের জন্য মোট যা জ্বালানি লাগে —প্রায় দু হাজার একশো কোটি গ্যালন - তা তৈরি করে দেবে শৈবালের দল। সমুদ্রের উপরিতলে দশ একর জুড়ে এই তেল চাষ হবে। নানা অসুবিধের প্রসঙ্গ এই পদ্ধতিকে জড়িয়ে থাকলেও ভাবনাটা যে দুর্দান্ত তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

জ্বালানি নিয়ে এমন নতুন ভাবনার কথা উঠে আসে প্রায়শই। খবরের কাগজের ভেতরের কোনও পাতায় শিরোনাম হয়। আমরা উৎফুল্ল হই। ক্ষণিকের জন্য ভাবি আরও এক সমাধানের যাদুকাঠি বুঝি হাতে এল আমাদের। বলি, জয় হোক প্রযুক্তির। দৃঢ় বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় - শক্তির সঙ্কট থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সব কিছুকেই সামলে দেব প্রযুক্তির শক্তিতে। অনুচ্চারিত থাকে যে কথাটা তা হল আমাদের জীবনযাত্রাটাকে রাখব একই স্তরে, একই গতিতে, ভোগ-উপভোগের একই তীব্রতায়। সত্যিই কি এই পথেই আমাদের ভাল থাকার উপাদান ছড়িয়ে আছে? বলা মুশকিল। তবে আমাদের দেশ মার্কিন বিদেশমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছে যে আমরা কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমাব না। অন্তত নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্যমাত্রায়

এর পর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর

বাঁধা পড়বে না ভারতবর্ষ। উন্নয়নশীল বেশ কিছু দেশ এই মানসিকতাই ধরে রেখেছে।

এই মনোভাব সঙ্গত না অসঙ্গত তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। আসলে উন্নয়নের স্বাদ পাওয়া তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশ হঠাৎ করে তাদের উৎপাদনের গতি কমাতে চায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই পথে উন্নয়নের সমস্ত ক্ষীরটুকু খেয়ে আজ পরামর্শ দিতে এলে চিন-ভারত শুনতে যাবেই বা কেন? তারা চাইবে নতুনতর প্রযুক্তি যা সব শক্তি তথা পরিবেশের সঙ্কট ঘুচিয়ে দিতে পারে। প্রযুক্তিবিদ্‌দের এত ক্ষমতা কি আছে? আগে চাহিদার বহরটা শোনা যাক। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি ২০০৭ সালের রিপোর্টে ভবিষ্যতের যে শক্তির চাহিদা তুলে ধরেছে তা মারাত্মক। বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশ যদি তাদের বর্তমান শক্তি ব্যবহারের নীতিতে দৃঢ় থাকে তবে ২০৩০ সাল নাগাদ শক্তির চাহিদা ২০০৭-এর তুলনায় বেড়ে যাবে পঞ্চাশ শতাংশ। একই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণও বাড়বে সাতান্ন শতাংশ। অতিরিক্ত শক্তির চাহিদার অর্ধেকটাই আসবে চিন ও ভারতের কাছ থেকে। বলে রাখা দরকার, এই ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি কোনও নিরপেক্ষ সংগঠন নয়। বস্তুতপক্ষে এদের বলা হয় ধনী দেশগুলোর প্রহরী। সুতরাং এমন সংস্থার রিপোর্টে চিন বা ভারতের প্রশাসকরা ত্রুটি খুঁজতেই পারেন। তবে পরিসংখ্যানগুলোকে তারাও বোধহয় পুরোপুরি নস্যাৎ করতে পারবেন না। এখন মূল প্রশ্নটা হল, এই চাহিদার সবটাই কি দূষণহীন, পরিবেশ বান্ধব, বিকল্প জ্বালানি দিয়ে মেটানো সম্ভব? শক্তি বিশেষজ্ঞদের মত হল, কখনোই না। আসলে খবরের কাগজে মাঝেমাঝেই যে চোখ ধাঁধানো সৌরচালিত বা ব্যাটারি চালিত গাড়ির কথা পড়ি তা কখনোই মাস প্রডাকশনের মিছিলে ঢুকছে না, বড়জোর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে থেকে যাচ্ছে। ভাবুন না, ২০০১ সালে ব্যাঙ্গালোরে যে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি 'রেভা'-র উদ্বোধন হয়েছিল তার ক'টা আমরা রাস্তায় চলতে দেখেছি? এখনও কোনও জায়গায় সেটা পার্ক করা থাকলে তা বেশ দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে ওঠে সবার কাছে। বাড়ির রেফ্রিজারেটর থেকে হাতের সেলফোনেও একই গল্প। হঠাৎ করে কোনও একটা কোম্পানি সৌরশক্তিতে চার্জ করা যায় এমন সেলফোন বের করে ফেললেই গোটা শিল্পটা পরিবেশ বান্ধব হয়ে যায় না। তবে হ্যাঁ, বিদ্যুৎ চালিত নানা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচ কতটা কম করা যায় তার বেশ কিছু প্রচেষ্টা তথা প্রযুক্তি আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তাদের বহুল উৎপাদনের বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের কথা যদি মাথায় রাখি তবে ওই শক্তি সংরক্ষণে কাটাকুটি হয়ে অঙ্কটা শক্তি অপচয়ের ঘরেই ভারী হয়ে পড়ে।

তা হলে? সমাধানটা প্রযুক্তিতে নয়, দর্শনে। গান্ধিজির কথাটা পুরনো হলেও আজও খাটে। এ পৃথিবী সবার প্রয়োজন মেটাতে পারে কিন্তু লোভ মেটাতে পারে না। আবার এই 'লোভ' শব্দটা এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্যতম সংজ্ঞা উপস্থিত করলে প্রেক্ষিতটাই বদলে যেতে পারে। লোভ আসলে তৈরি করা হয়। ব্যবসার স্বার্থেই ব্যবসায়ী এমন বাড়ি-ঘর-আসবাবের ছবি দেখান যা লোভী ক্রেতা তৈরি করবে। এখনও পর্যন্ত এই প্রলোভনের মডেলগুলো ভীষণ শক্তি-ঘন। মানে সেগুলো অনেক শক্তি বা এনার্জি চায়। সাধারণত সেগুলোতে কৃত্রিম আলো, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা খুব বেশি পরিমাণে থাকে। দৈহিক পরিশ্রমের বালাই প্রায় থাকে না বললেই চলে। এখন যদি প্রশ্ন করি, প্রলোভনের এই মডেলগুলোকে শক্তির চাহিদার দিক থেকে কি হাল্কা করা সম্ভব? অর্থাৎ সেখানে জ্বালানি পুড়িয়ে শক্তির জোগান দিতে হবে কম অথচ তা মানুষকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হবে না? বিকল্প ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এমন বহু আর্কিটেক্ট পরিবেশ-বান্ধব, শক্তির কম চাহিদাসম্পন্ন বাড়িঘরের পরিকল্পনা শোনাচ্ছেন বেশ কিছু দিন ধরে। বাড়িকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে দিনের আলো যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করে, দিনমানেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে হয় না। জলের ব্যবহারও যেন সেখানে খুব কম থাকে। জল অপচয়ের সঙ্গে শক্তির প্রশ্ন জড়িত কেন না নোংরা জল শোধনেও বেশ ভালো পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়। অতএব জলের ন্যূনতম ব্যবহার আবশ্যিক। তবে তার জন্য শুধু নাগরিকের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে না থেকে জলপ্রবাহের ধারা খুব ক্ষীণ থাকে এমন নলের কল লাগানো দরকার। এমন বাড়িঘর যেন মানুষ চায় তার মত পরিস্থিতি কি তৈরি করা সম্ভব? বাণিজ্যিক কূটকৌশল দেখে জীবন কেটে গেল যাঁদের তারা বলবেন, এটা একেবারেই অসম্ভব। মানুষের চোখে ঝাঁ-চকচক, শক্তি-ঘন মডেল আটকে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ওই জায়গা থেকে উপভোক্তাদের নড়ানো অসম্ভব। এতএব তারা দলে-দলে ছুটবেন ওই সব মডেলের দিকেই। আয় বাড়ার সঙ্গে ওই ধরনের পরিবেশ-প্রতিকূল বাড়ির সংখ্যা বাড়বে একেবারে গণতান্ত্রিক পথেই। তাহলে উপায়? একটাই। এই গণতান্ত্রিক গোলযোগকেই বন্ধ রাখা। একেবারে কেন্দ্রীয়ভাবে, পরিকল্পনা করে পরিবেশ-বান্ধব আবাস তৈরি করা।

এই দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে পরিবেশ নিয়ে ভাবা অবান্তর। ভেবে দেখুন, বহু বিশেষজ্ঞের কাতর আবেদন সত্ত্বেও আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে গণপরিবহন ব্যবস্থায় যথেষ্ট সরকারি বিনিয়োগ নেই। হতকুচ্ছিৎ, পেরেক বেরোনো, টায়ার ফাটা বাস আপনাকে অসুস্থ করে। সেখানে বাধ্য হয়ে চড়তে হয় আপনাকে। সুযোগ পেলেই আপনি গাড়ি কিনবেন, এ তো স্বাভাবিক। আর ততোটাই স্বাভাবিক ভাবে বাড়বে শক্তির অপচয় এবং দূষণ। ফলে গণপরিবহন উন্নত না হওয়া, গাড়ি শিল্পের মালিকদের পক্ষে সুখকর হলেও পরিবেশের পক্ষে মারাত্মক। অন্যদিকে এই গাড়ি কেনার ক্ষেত্রেও প্রলোভন কাজ করে নিখুঁতভাবে। সে প্রলোভনের ঠ্যালায় উন্নত বাস ব্যবস্থা থাকলেও অর্থবান মানুষ গাড়ি কিনবে গণতান্ত্রিক পথে। এখানেও তাই গণতন্ত্রে রাশ টানা দরকার। পয়সা থাকলেই গাড়ি কেনা যাবে না বা ইচ্ছেমত তা নিয়মিতভাবে রাস্তায় বের করা যাবে, এটা চলতে পারে না। এটা পরিবেশের উপর নিদারুণ নির্যাতন। তাই এখানে কড়া নির্দেশ জারি করা দরকার। এটাই পরিবেশ বাঁচানোর একমাত্র দর্শন। বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান নিয়ে কূটকচালির থেকে যার প্রয়োগ অনেক বেশি জরুরি।

অশ্রুদ্বীপ

বিশ্বজিত মুখোপাধ্যায়

('আয়লা' এক ক্রান্তীয় ঘূর্ণি ঝড়। ২৫ মে, ২০০৯ 'আয়লা' সুন্দরবনকে অসুন্দরে পরিণত করল। আয়লায় আক্রান্ত মানুষদের ত্রাণ দেবার জন্য চন্দননগরের সবুজের অভিযানের সভ্যরা ত্রাণবন্টনের উদ্যোগ গ্রহণ করল।

এর পর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

তাদেরই সফরসঙ্গী হয়ে সুন্দরবনে ত্রাণ বন্টনের সময় যে অভিজ্ঞতা হয় তারই নির্যাস এই লেখা।)

প্রকৃতির প্রতিশোধ : উষ্ণায়নের অশনি সংকেত নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে আলোচনা শহুরে মানুষের সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতা, কিন্তু উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খুব বেশি নেই। মিষ্টি জলের বন্যা আমরা অনেক দেখেছি, মহামারি দেখেছি, দেখেছি দুর্ভিক্ষ। কিন্তু সম্ভবত দেখা হয়নি নোনা জলের প্লাবনে মানুষের চরম ও মর্মান্তিক পরিণতি।

২৪ মে, ২০০৯ এর রাত থেকে সুন্দরবনের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ঝড়ের দাপট দেখতে সুন্দরবনের মানুষ থেকে জীবজন্তু সবাই অভ্যস্ত। ২৪ মে-র কালো আকাশ চিন্তিত করতে পারেনি সুন্দরবনের মানুষকে। ২৫ মে বেলা ১০টা, হঠাৎ করে ঝড়ের তীব্রতায় কেঁপে উঠল সুন্দরবনের খড়ের বাড়িগুলো, আর চালের মাথাগুলো প্রায় খড়কুটোর মত ভেঙে পড়ল। সুন্দরবনের দ্বীপে মানুষ বসবাস আরম্ভ করেছিল মাটির বাঁধ দিয়ে। হঠাৎ করে নদী ফেঁপে উঠল। কম করে ৫ থেকে ৭ ফুট মাটির বাঁধের ওপর জল ঢুকে পড়ল বা কোথাও মাটির বাঁধ ভেঙে নদী ছুটে এল গ্রামগুলিকে গ্রাস করতে। বছরের পর বছর সুন্দরবনের মানুষ নদীর গতিকে বাঁধার চেষ্টা করেছে, তার প্লাবনভূমিকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। নদী আজ ফিরে পেতে চায় প্লাবনভূমি। নদীর চাহিদা আজ সুন্দরবনের মানুষের কাছে ফিরে এসেছে প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম মেনে। প্রকৃতির রোষে আক্রান্ত হয়েছে কমপক্ষে ৪০ লক্ষ মানুষ। সুন্দরবনের ছোটমোল্লাখালি দ্বীপের কালিদাসপুর গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ মাদার চন্দ্র গায়েনের কথায়, 'কত ঝড় দেখেছি কিন্তু আয়লার মত ঝড় কখনও দেখিনি।' তার ৭৩ বছর বয়স, আয়লার ঝড়ে সে আজ নোনা দ্বীপের এক নিঃসঙ্গ মানুষ।

একটু জল দাও : ২ জুন, ২০০৯ আয়লা থেমে গেছে কিন্তু আয়লার অভিশাপ সমস্ত সুন্দরবন জুড়ে। সর্বত্রই এক নিদারুণ হাহাকার, জল নেই, বাসস্থান নেই - সবই প্রকৃতির রোষে অমিল। কয়েক হাজার মানুষ ভেঙে যাওয়া বাঁধের ওপর রাত কাটাচ্ছে। মাথার ওপর খোলা আকাশ, আর পায়ের তলায় নোনা জল। অসংখ্য গবাদি পশু মারা গেছে, তাদের দেহে পচন ধরেছে, গন্ধে টেকা যায় না। তবুও তার পাশেই মা ছেলেকে নিয়ে বসে আছে একটু বাঁচার আশায়। ওরা কেউ জানে না কখন ত্রাণ আসবে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর হেলিকপ্টার ঘুরে যাচ্ছে আর ছুঁড়ে ফেলছে ত্রাণসামগ্রী আর জলের প্যাকেট। তাই পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে এক প্রবল দ্বন্দ্ব। লঞ্চে করে কিছু ত্রাণসামগ্রী বিলি করে ফেরার মুখে দেখি পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলে ক্রমাগত আমাদের দিকে চিৎকার করছে, আর একটু জল চাইছে। কিন্তু কোথায় জল! জলের হাহাকারের কথা পুঁথিতে পড়েছিলাম, চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে গতখালি ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম, আমরা নিঃসহায়। ওদের হাহাকার শোনা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ঘড়া ভর্তি মিষ্টি জল দেখে মনে হল আমি পৃথিবীর সুখীতম মানব সন্তান।

মানুষ আছে, আবরণ নেই : ১৮ জুন, ২০০৯ আবার সুন্দরবনে ত্রাণ বন্টনের জন্য রওনা দিলাম, সঙ্গে সবুজের অভিযানের একগুচ্ছ দামাল ছেলে। ওরা বাড়ি বাড়ি ঘুরছে, চাল ডাল সংগ্রহ করছে। সেই বাচ্চা ছেলেটির জলের হাহাকার আবার টেনে এনেছে আয়লা বিধ্বস্ত এলাকায়। ছোটমোল্লাখালি কালিদাসপুর গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রাণবন্টনের কাজ আরম্ভ হল। ওই এলাকার মাষ্টারমশায় শ্রী গোপাল মণ্ডল ও তার বন্ধুরাই কীভাবে ত্রাণবন্টন হবে তার বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগী হল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, ত্রাণ নিতে হাজির হচ্ছে বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলে মেয়ে। দূর এলাকা থেকে নোনা জল ভেঙে বাচ্চারা আসছে সামান্য চাল আর আলু পেতে। কিন্তু চাল আলুও নেবে কী করে। কেউবা জামা খুলে বেঁধে নিচ্ছে অথবা কেউ আবার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে পাত্র আনতে। ত্রাণ বন্টনের কাজ শেষ করে যখন লঞ্চে উঠছি তখন গোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের গ্রামের বাচ্ছারা কেন ত্রাণ নিতে আসছে? ওদের অভিভাবকরা কোথায়? গোপাল মাষ্টার সঙ্কুচিতভাবে আমায় পাশে ডেকে নিলেন, বললেন, 'মেয়েরা আসবে কী করে। আয়লা ওদের আবরণ পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। আয়লার দিন সকাল বেলায় যে জামাকাপড় গায়ে ছিল, তারপরে আর জামা কাপড় পরিবর্তন করতে পারেনি, কারণ সবই নদীর স্রোতে ভেসে গেছে।'

চাল আছে হাঁড়ি নেই : ৩ জুলাই, ২০০৯ আবার সুন্দরবনের পথে পা বাড়ালাম। এবার নিশানা ছোটমোল্লাখালির গোবিন্দপুর গ্রাম। গ্রামটি মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত। প্রতুল মণ্ডল, নিতাই হাইলি উদ্যোগ নিয়ে গোবিন্দপুর জুনিয়র হাইস্কুলে আমাদের বসালেন। বহু দূর থেকে মানুষেরা স্কুল বাড়িতে জড়ো হতে লাগল। উপোসীমুখ, উস্কো খুস্কো চেহারা, চোখমুখে এক নিদারুণ বিষণ্ণতা। স্কুলের সামনে এসে ঝিম মেরে বসে আছে কয়েকশো মানুষ, ত্রাণের আশায়। সবুজের অভিযানের ছেলেরা বিভাবসু তোষের নেতৃত্বে ত্রাণ বন্টন আরম্ভ করল। আমি ঘুরে ঘুরে ওদের ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। প্রত্যেকেই প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে। নোনাজল ভর্তি মাঠের দিকে তাকিয়ে বলছে যে তারা জানে না কবে আবার ওই জমিতে চাষ হবে। নোনা জল মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেছে, অন্তত কয়েক বছর চাষ করা অসম্ভব। এক নিদারুণ হতাশা ওদের গ্রাস করেছে। ওদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে ওদের ভেঙে যাওয়া গ্রামের মধ্যে ঘুরছিলাম। পথের ধারে এক থুরথুরে বুড়ি লাঠি হাতে বসে আছে। সে ত্রাণ নিতে আসেনি। কারণ জিজ্ঞাসা করতে অশীতিপর বৃদ্ধা, গ্রামের মানুষ যাকে টুকিবুড়ি বলে ডাকে, সে বলল ত্রাণ নিয়ে কী হবে। আমার তো ঘর গেছে, হাঁড়িটাও ভেসে গেছে, রাঁধব কীসে। হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, 'আমাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে।' খোঁজ নিয়ে জানলাম তার ছেলে পরিবার নিয়ে অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করেছে। গ্রামে আর তাদের কিছুই নেই। বৃদ্ধা মাকে রেখে গেছে গ্রামের মাটিতে, সম্ভবত বৃদ্ধাও যেতে চায়নি গ্রাম ছেড়ে। পড়ন্ত বেলায় টুকি বুড়ির কান্না নোনা জলে আছড়ে পড়ে। আমি নির্বাক।

জীবন গেছে থেমে : ১৮ জুলাই, ২০০৯, টুকি বুড়ির কান্না আমাদের আবার টেনে নিয়ে গেল সুন্দরবনে। ছোট মোল্লাখালির আরও ভেতরের গ্রামে ঢুকে গেলাম। দুপাশে নোনা জলের ভরা মাঠ। তারই মাঝখান দিয়ে ইটপাতা এক চিলতে রাস্তা। জলের তোড়ে রাস্তা ভেঙে গেছে। তার মধ্য দিয়ে আমাদের ছেলেরা আর গ্রামের মানুষেরা ত্রাণ নিয়ে চলল ছোট মোল্লাখালির অভ্যন্তরে। প্রতুল মণ্ডল, গোপাল মণ্ডল ছোট মোল্লাখালি গ্রামের ভিতরের দুর্দশার কথা জানিয়েছিল। তাদেরই পরামর্শে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ। পথের দুপাশে ভাঙা বাড়ির চিহ্ন। বিদ্যালয়ে পড়াশুনা বন্ধ,

এর পর ছয়ের পাতায়

পাঁচের পাতার পর

খাতা বই সবই ভেসে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সভ্যতা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের মানুষ জানে না কবে কীভাবে তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। সবাই নেই-রাজ্যের মানুষ। সমস্ত গ্রাম জুড়ে বিলাপের ধ্বনি। সাতরঙা পৃথিবী ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

মৃত্যুরে কে মনে রাখে? — কীর্তিনাশা খুঁড়ে চলে বারো মাস
নতুন ডাঙার দিকে - পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায় - শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ?

পৃথিবী আমাদের চায়

আমরা চাই পৃথিবী

বেবী বসু (গুপ্ত)

একদিন যে বসুন্ধরা তার সবটুকু শক্তি দিয়ে জীবকূলের জন্মলগ্নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাকেই আজ সর্বাপেক্ষা 'বুদ্ধিমান প্রজাতি মানুষ' বিনষ্টির দিকে নিয়ে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ বিশ্ব পরিবেশের বিপন্নতা ও জলবায়ুর অশুভ পরিবর্তনকে ঠেকাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর লাতিন আমেরিকার দেশগুলি যেভাবে পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা লক্ষ্যণীয়। ভূপৃষ্ঠস্থ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি, তথা নিয়ত প্রবহমান বায়ু ও জলচক্র এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষও প্রাণীজগতের স্বাভাবিক বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে বহুলাংশে। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৃথিবীর চুম্বক মেরুর দিক পরিবর্তন। ভূপৃষ্ঠস্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলগুলির রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় বোঝাপড়ার মাধ্যমে যদি আন্তর্জাতিক সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির যৌথ উদ্যোগ ইতিবাচক হয় তবে ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত রেখে জলবায়ুগত বিবর্তনকে ঠেকাতে না পারলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল অকল্যাণকর অবস্থার উন্নতিকরা সম্ভব। এ ব্যাপারে ভারতীয় উপমহাদেশের SAARC গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি উপযুক্ত কর্মসূচি নিতে পারে।

মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি হল সুবৃহৎ হিমবাহগুলির আবাসস্থল - যা এশিয়ার চারটি স্বাভাবিক জলনির্গম প্রণালীর উৎসমুখ। এই সুবৃহৎ মহাদেশের চিরস্রোতঃস্বিনী নদীগুলির গতিপথ জীবদেহের শোণিত-বাহী শিরা-উপশিরার ন্যায় এই বিশাল ভূখণ্ডকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্পরাশি বায়ুমণ্ডলে ঘনীভূত হয়ে বারিবিন্দু রূপে ঝরে পড়ছে এই উচ্চ ভূমিতে — হিমরেখার ঊর্ধ্বে হিমবাহের সূতিকাগৃহে নব হিমবাহ জন্ম ও বৃদ্ধি লাভ করছে। কী সুমেরু সাগরগামী, কী দক্ষিণ প্রবাহী, কী পূর্ববাহিনী, সকল নদীকে জলপ্রবাহে সমৃদ্ধ করে রেখেছে এই অঞ্চলের হিমবাহগুলি। তাই বিশ্ব উষ্ণায়ন যেন কোনও ভাবেই হিমক্ষেত্রগুলিকে সংকুচিত করে এই হিমভাণ্ডারকে নিঃশেষের দিকে না নিয়ে যেতে পারে। অন্যথায় ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু আশ্রিত, প্রধানত আর্দ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ভবিষ্যতে হয়ে পড়তে পারে শুষ্ক মরু সদৃশ। SAARC গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি ও চিন এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এশিয়ার পশ্চিমাংশের উষ্ণ মরু অঞ্চলের আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য কারেজ পদ্ধতি দ্বারা প্রয়োজন যৌথ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভূপৃষ্ঠের তলদেশে সুরঙ্গপথে খাল খনন করে তাৎক্ষণিক নদীপ্রবাহের Sheet flood বন্ধ করে ভূ-গর্ভস্থ জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি করা। এর দ্বারা মরু বিস্তার রোধ করা যেতে পারে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তিই পারে সমগ্র আনাতোলিয়া ও আরব উপদ্বীপের শুষ্কতা-আর্দ্রতার মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য সুরক্ষিত করতে। মরু-জলবায়ু যেন পার্শ্বিক অঞ্চলকে গ্রাস না করে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বদ্বীপের দক্ষিণে বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। হিমালয়ের পাদদেশের তরাই-ডুয়ার্সের অরণ্যানীর মত দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ বনভূমিও সজীব প্রজাতির ভারসাম্য রক্ষায় একনিষ্ঠ। সুতরাং এই বনভূমির লালনপালন ও দূষণ মুক্তি আবশ্যক। এই ম্যানগ্রোভ বনভূমি একদিকে উপকূলীয় ভাঙন ঠেকায় আবার নতুন পলল সঞ্চয়ে সাহায্যকারী হয়ে সক্রিয় বদ্বীপ সৃষ্টি করে চলেছে। এটি প্রতিহত করতে পারে সুনামির মত বিপজ্জনক অভূতপূর্ব কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিনষ্টকারী খর-বায়ু প্রবাহের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয়কেও রোধ করতে পারে এই বনভূমি। স্বভাবতই জলবায়ুর সঙ্গে রয়েছে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

আমাদের মনে রাখতে হবে অনুকূল জলবায়ু প্রকৃতির দান কিন্তু তাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব মানুষের। এই কর্মকাণ্ডে UNEP-র স্লোগান 'Your Planet Needs you. Unite to combat climate change' বাস্তবায়িত করতেই হবে।

সবুজের অভিযান প্রকাশিত বই

১. ল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (১৯৯২)।
২. দ্য ইগনোরড্ এনভায়রনমেন্ট : উপেক্ষিত পরিবেশ (১৯৯৮)।
৩. রণনীতি ও রণকৌশলের ইতিহাস (২০০৩)।
৪. অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা (২০০৩)।
৫. পরিবেশ (২০০৩)।
৬. ধূসর বসুধা (২০০৩)।
৭. এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়েকনিং (২০০৫)।
৮. এত আঁধার কেন (২০০৮)।
৯. প্রসঙ্গ : যুদ্ধ ও পরিবেশ (২০০৮)।
১০. প্রসঙ্গ : মানবাধিকার ও পরিবেশ (২০০৮)।
১১. শিকড়ের সন্ধানে : হুগলি জেলা (২০০৯)।
১২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ফিরে দেখা (২০০৯)।
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন : এক অশনি সংকেত (২০০৯)।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৫৭৫৩৬৪; ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in